আগমনী

দুর্গাপূজা : শ্রীচৈতন্য-সংস্কৃতিতে শক্তিসাধনা

সুমনা সাহা

সাহিত্যসেবী ও সুলেখিকা

গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, জগতে যখনই ধর্মগ্লানি উপস্থিত হয়, মানুষের মনের শুভ বোধকে দমিত করে অশুভ বোধ প্রবল হয়ে উঠে অধর্মের অভ্যুত্থান হয়, তখনই সাধুব্যক্তি ও ধর্মের রক্ষায়, দুষ্কৃতের বিনাশ করতে ঈশ্বর স্বয়ং অবতরণ করেন। শ্রীচৈতন্যের জন্মও এমনই এক সংকটময় যুগসন্ধিক্ষণে। একদিকে হিন্দুধর্মের সংকীর্ণতা, গোঁড়ামি, ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের জোরজুলুম, নিচু সম্প্রদায়ের মানুষকে অস্পৃশ্যজ্ঞানে সবরকম সুযোগসুবিধা থেকে বঞ্চিত করে দূরে সরিয়ে রাখা, সুরাসক্ত ও বামাচারী শাক্ত সম্প্রদায়ের প্রতি সাধারণ মানুষের ঘৃণা, অন্যদিকে মুসলমান শাসকের অত্যাচার থেকে নিষ্কৃতির উপায়—এই দুই মিলিয়ে হিন্দুরা দলে দলে মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করতে আরম্ভ করেছিল। চৈতন্যদেব আচণ্ডালে কোল দিয়ে ও নগরকীর্তনে জনগণকে মাতিয়ে গোঁড়া বৈষ্ণব সম্প্রদায়ে এক নতুন উদার দৃষ্টি ও প্রেমের জোয়ার আনলেন। তাঁকে 'সংকীর্তনের পিতা' বলা হয়। তিনি বললেন, যে একবারও প্রেমভরে কৃষ্ণনাম নেয়, সে-ই পরম বৈষ্ণব; শূদ্র-মুচি-মেথর সকলেই কৃষ্ণভজনের অধিকারী। বলা হয়, শ্রীচৈতন্যদেবের অন্তরে কৃষ্ণ, বাইরে রাধাভাব। এহেন চৈতন্যদেব কিন্তু দেবী দুর্গার ভক্ত ছিলেন, তাঁর মধ্যে দুর্গার আবির্ভাব হয়েছিল এবং প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে কয়েকটি দুর্গাপুজো আরম্ভের সঙ্গে তিনি যুক্ত।

পাণ্ডিত্যের সঙ্গে নিমাইয়ের ছিল সংবেদনশীল ও অনুভবী মন। অতএব দেশ-কাল-পরিস্থিতি সম্পর্কে তিনি যথেষ্ট সচেতন ছিলেন বলা যায়। সমাজের অবক্ষয়, অত্যাচারী মুসলমান শাসকের প্রভাবে হিন্দুর ধর্মসংকট—তাঁর অজানা ছিল না। কিন্তু ধর্ম-আন্দোলন বা সমাজ সংস্কার করবেন ভেবে পরিকল্পনা করে তো তিনি কিছু করেননি।

শ্রীরামকৃষ্ণ পরিমণ্ডলের একটি কথা এই প্রসঙ্গে স্মরণ করতে পারি। জনৈক ভক্ত বলছিলেন, শ্রীরামকৃষ্ণ ধর্মসমন্বয় করেছেন। সেকথা শুনে শ্রীমা সারদা দেবী বলেন, ''তিনি তো মতলব করে কিছু করেননি। তাঁর ছিল স্বাভাবিক ত্যাগ...।'' শ্রীচৈতন্য বা শ্রীরামকৃষ্ণ অবতারপুরুষ। তাঁদের জীবন আলোচনা করতে হলে ঐতিহাসিক

দৃষ্টিভঙ্গির থেকেও অনেক বেশি আশ্রয় করতে হবে গভীর মনন ও অনুভূতির আলো।

তার্কিক নিমাই পিতার পারলৌকিক ক্রিয়া করতে গয়ায় গেলেন, সেখান থেকেই তাঁর ইহলৌকিক জীবনের বাঁক বদল হল। ফিরে এলেন এক অন্য নিমাই। তাঁর চোখে অবিরল ভগবদ্‌বিরহের অশ্রু, মুখে 'হা কৃষ্ণ' 'হা কৃষ্ণ' হাহাকার। তিনি সকলকে হরিনামের মাহাত্ম্য বুঝিয়ে বললেন এবং কলিযুগে হরিনাম বিনা মুক্তির আর অন্য উপায় নেই, একথাও প্রচার করতে লাগলেন। আরম্ভ হল নগরকীর্তন। সারা রাত শ্রীবাস আচার্যের ঘরে গোপনে দ্বার রুদ্ধ করেও চলত কীর্তন। সন্ন্যাস গ্রহণ করে গৃহত্যাগের পূর্ব পর্যন্ত এইভাবে অন্তরঙ্গ ভক্তদের নিয়ে তিনি কীর্তন, ভজন, শাস্ত্রালোচনা করে সময় কাটাতেন।

এই সময়ে একদিন নিমাই ঘোষণা করলেন যে আজ নাটক হবে—'আজি নৃত্য করিবাম অঙ্কের বন্ধনে'। অঙ্কের বন্ধনে নৃত্যের অর্থ নাট্যাভিনয়। ঠিক হল, অভিনয় হবে চন্দ্রশেখর আচার্যের বাড়িতে। সকলের জন্যেই অবারিত দ্বার, বাড়ির মেয়েদেরও ডাকা হল। কী পালা হবে, কে কোন চরিত্রে অভিনয় করবেন, সবকিছু নিমাই নিজেই ঠিক করে দিলেন। নাটক সম্ভবত 'রুক্মিণীহরণ'। শ্রীবাস পণ্ডিত হবেন নারদ, হরিদাস ঠাকুর বৈকুণ্ঠের কোটাল, ব্রহ্মানন্দ সাজবেন গদাধরের বড়াই, নিত্যানন্দ হবেন মহাপ্রভুর বড়াই ইত্যাদি। গদাধর পণ্ডিতকে একবার রমা (লক্ষ্মী), একবার গোপিকা (বা রাধা?) বলা হয়েছে। অদ্বৈত আচার্য জিজ্ঞাসা করলেন কৃষ্ণ কে হবে। নিমাই বললেন, ''সিংহাসনে গোপীনাথ।'' অর্থাৎ কৃষ্ণবিগ্রহ বা শালগ্রামকে (যেকোনও একটি অর্চামূর্তিকে) অভিনয়ের অঙ্গ করে নেওয়া হবে। একান্ত অনুগত বুদ্ধিমন্ত খানকে নিমাই সকলের সাজপোশাকের ব্যবস্থা করতে বললেন। নিমাই নিজে লক্ষ্মীর বেশে নৃত্য করবেন বললেন। কিন্তু নাটকের শুরুতে রুক্মিণীর আবেশে তিনি স্বয়ংবরের আগে কৃষ্ণকে চিঠি লিখতে লাগলেন। এটিও ভেবেচিন্তে হয়নি, নাটকের বিষয় ও চরিত্র আগে থেকে ঠিক করা হলেও ভাবের আতিশয্যে কিছু বদলে গেল।

আঙিনায় 'কথুয়ার চান্দয়া' অর্থাৎ চন্দ্রাতপ বা শামিয়ানা খাটানো হয়েছিল। অদ্বৈত আচার্যকে কোনও চরিত্র দেওয়া হয়নি, তিনি অভিমান করলে নিমাই তাঁকে বললেন, ''সব চরিত্রই তো তোমার!'' বস্তুত দেখা গেল অদ্বৈত আচার্য 'সর্বভাবে নাচে মহা বিদূষক প্রায়'। হরিদাসের অভিনয় দেখে দর্শকরা হাসি সামলাতে পারলেন না, শ্রীবাসের অভিনয় দেখে শচীমাতা মূর্ছা গেলেন, অন্যান্য ভূমিকার অভিনেতাদের সঙ্গে দর্শকরা হাসিঠাট্টা করতে লাগলেন। এভাবে নাটক বেশ চলছিল, কিন্তু বাধ সাধলেন নিমাই পণ্ডিত। তিনি প্রথমে বলেছিলেন লক্ষ্মীর বেশে নৃত্য করবেন, কিন্তু অভিনয় শুরু করলেন রুক্মিণীর ভাবে, শেষ পর্যন্ত প্রবেশ করলেন আদ্যাশক্তির ভাবে। বিবাহের দিন সকালে রুক্মিণী দেবী ভবানীর মন্দিরে প্রণাম করতে গেছেন। সেই দৃশ্যের সজ্জা এমন নিপুণ হয়েছিল যে, স্বয়ং শচীমাতাও নিমাইকে চিনতে পারছিলেন না। বৃন্দাবনদাসের বর্ণনায় মহাপ্রভুর সাজ কীরকম? সীতা, লক্ষ্মী, মহালক্ষ্মী, পার্বতী, রাধা, গঙ্গা, মহামায়া প্রভৃতি নানা রূপ যেন তাঁর মধ্যে ঝলসে উঠছে। নাচতে আরম্ভ করলেন মহাপ্রভু। সেই নাচের মধ্যেও বিচিত্র ভাবের সমাহার—যোগেশ্বরী, মহাচণ্ডী, রেবতী, রাধিকা আরও কত! ''অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে যত নিজ শক্তি আছে।/ সকল প্রকাশে প্রভু রুক্মিণীর কাছে॥'' সেই অপরূপ নৃত্য দেখে সকলেই ভাবাবিষ্ট, নিত্যানন্দ মূর্ছিত হয়ে পড়ে গেলেন। নিমাই সিংহাসনে উঠে কৃষ্ণবিগ্রহ কোলে নিয়ে বসে পড়লেন। সকলে তখন তাঁকে ঘিরে স্তবস্তুতি করতে আরম্ভ করল। ''কেহ পড়ে লক্ষ্মীস্তব কেহ চণ্ডীস্তুতি।'' 'চৈতন্যভাগবত' গ্রন্থের

পাঠক স্তম্ভিত হয়ে মানসপটে দেখেন—

''কভু দুর্গা কভু লক্ষ্মী হয়েন চিচ্ছক্তি।
খাটে বসি ভক্তগণে দিলা প্রেমভক্তি॥''

শক্তির আবেশে মহাপ্রভুর জননী-ভাব দেখে ভক্তরা নানাভাবে তাঁর স্তবস্তুতি করতে লাগলেন—

'' 'জননী-আবেশ' বুঝিলেন সর্ব্বজনে।
সেই-রূপে সভে স্তুতি পঢ়ে প্রভু শুনে॥...
জয় জয় জগত-জননী, মহামায়া।
দুঃখিত-জীবেরে দেহ চরণের ছায়া॥
জয় জয় অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড-কোটিশ্বরী।
তুমি যুগে যুগে ধর্ম্ম রাখ অবতরি॥
ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর তোমার মহিমা।
বলিতে না পারে, অন্য কে দিবেক সীমা॥
জগত-স্বরূপা তুমি, তুমি সর্ব্বশক্তি।
তুমি ব্রহ্মা, দয়া, লজ্জা, তুমি বিষ্ণুভক্তি॥
যত বিদ্যা—সকল তোমার মূর্ত্তিভেদ।
'সর্ব্ব-প্রকৃতির শক্তি তুমি' কহে বেদ॥
নিখিল ব্রহ্মাণ্ডে পরিপূর্ণ তুমি মাতা।
কে তোমার স্বরূপ কহিতে পারে কথা॥
তুমি ত্রিজগত-হেতু গুণত্রয়ময়ী
ব্রহ্মাদি তোমারে নাহি জানে, জানে কোই॥
সর্ব্বাশ্রয়া তুমি সর্ব্বজীবের বসতি।
তুমি আদ্যা অবিকারা পরমা প্রকৃতি॥
জগত-আধার তুমি দ্বিতীয়া-রহিতা
মহীরূপে তুমি সর্ব্ব-জীবপালয়িতা॥
জলরূপে তুমি সর্ব্ব-জীবের জীবন
তোমা স্মঙরিলে খণ্ডে অশেষ-বন্ধন॥
সাধুজন-গৃহে তুমি লক্ষ্মী মূর্ত্তিমতী।
অসাধুর ঘরে তুমি কালরূপাকৃতি॥
তুমি সে করাহ ত্রিজগতে সৃষ্টি-স্থিতি।
তোমায় না ভজিলে পায় ত্রিবিধ দুর্গতি॥
তুমি শ্রদ্ধা বৈষ্ণবের সর্ব্বত্র-উদয়া
রাখহ জননি! চরণের দিয়া ছায়া॥
তোমার মায়ায় মগ্ন সকল সংসার।

তুমি না রাখিলে মাতা! কে রাখিবে আর॥
সভার উদ্ধার লাগি তোমার প্রকাশ।
দুঃখিত জীবেরে মাতা! কর নিজ দাস॥
ব্রহ্মাদির বন্দ্য তুমি সর্ব্ব-ভূত-বুদ্ধি।
তোমা স্মঙরিলে সর্ব্ব-মন্ত্রাদির শুদ্ধি॥
এইমত স্তুতি করে সকল মহান্ত।
বর-মুখ মহাপ্রভু শুনয়ে নিতান্ত॥''

(চৈতন্যভাগবত, অষ্টাদশ অধ্যায়)

নিমাই সন্ন্যাস নিয়ে যখন গৃহত্যাগ করলেন, ওড়িশায় পৌঁছে তিনি গিয়েছিলেন 'একাম্রক্ষেত্র'—আজকের ভুবনেশ্বরে। ভুবনেশ্বরে লিঙ্গরাজ শিবের রাজ্যপাট। সেখানে শিবমহিমা বর্ণনা করে অনেক নৃত্যগীত করেছিলেন মহাপ্রভু। গৌরাঙ্গের মধ্যে যে এই জগজ্জননী ভাব বা শিবের উদ্দেশে নৃত্য, এতে স্ববিরোধিতা নেই। দাঁত ও জিভের সহাবস্থানের মতোই নিজেদের মধ্যে এমনকী প্রকৃতির মধ্যেও কত স্ববিরোধিতা প্রতিনিয়তই আমরা লক্ষ করি না। যেমন, ভাগবতে রুক্মিণীকে লক্ষ্মীর অবতার বলা

হয়েছে অথচ সেই রুক্মিণী যাঁর মন্দিরে পুজো দিতে যাচ্ছেন, তিনি গিরিজা, অম্বিকা বা ভবানী—ভবানীর সঙ্গে ভব বা শিবও যে সেখানে নিত্যযুক্ত! কৃষ্ণ-কামনায় গোপিনীরা ব্রজে কাত্যায়নী দুর্গার পুজো করেছেন। শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণবের আপাত ভেদবুদ্ধির গভীরে সব নদী মিশে যায় এক সাগরে—তার মূলে হিন্দু দর্শনের অভেদ তত্ত্ব।

একদা নবদ্বীপ ছিল বঙ্গসংস্কৃতির প্রাণকেন্দ্র। চৈতন্য মহাপ্রভু ছাড়াও বহু শাক্ত পণ্ডিতের পদধূলিধন্য নবদ্বীপ ধাম। নিমাই টোলে যাওয়ার আগে নবদ্বীপের বিখ্যাত ধর্মসংস্কারক কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ প্রতিষ্ঠিত আগমেশ্বরী কালীমন্দিরে প্রণাম করে যেতেন বলে লোকমুখে প্রচলিত। চৈতন্য পূর্ববর্তী ও সমকালে নবদ্বীপের প্রধান উৎসব ছিল পট পূর্ণিমা যা কালক্রমে রাসকালী পুজো নামে বিখ্যাত হয় এবং সেই ধারা আজও অব্যাহত। নবদ্বীপের রাসপূর্ণিমা একটি শাক্ত উৎসব। পাঁচশো-ছশো বছর ধরে নবদ্বীপের পণ্ডিতরা কার্তিক পূর্ণিমায় (রাসপূর্ণিমা) কুলদেবীর বাৎসরিক আরাধনা করে আসছেন। মহিষাসুরমর্দিনী ও শ্যামাকালীই বিভিন্ন নামে নবদ্বীপে কুলদেবীরূপে পূজিতা হন। ডুমুরেশ্বরী মাতা ও মহিষমর্দিনী মাতা হলেন এরকমই দেবী, নবদ্বীপে যাঁরা সাতশো বছরেরও বেশি সময় ধরে পুজো পেয়ে আসছেন।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু কাটোয়াতে কেশবভারতীর কাছে সন্ন্যাসদীক্ষা নিয়েছিলেন। তাই নবদ্বীপের পরই কাটোয়া শক্তি আরাধনার সঙ্গে বৈষ্ণব ধারার সুন্দর সমন্বয় ঘটিয়েছে। কাটোয়ার জেলেপাড়ার দাসচৌধুরী পরিবারের বৈষ্ণব ভাবের দুর্গাপুজো চারশো বছরের ঐতিহ্য বয়ে নিয়ে চলেছে। এই পরিবারের আরাধ্য দুর্গা চতুর্ভুজা। বিষ্ণুর চারহাতের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখেই দশ হাতের স্থানে এসেছে চার হাত। ওপরের দুটি হাতে খাঁড়া ও চক্র এবং নীচের দুই হাতে ত্রিশূল ও সাপ। দুর্গার বাহন সিংহের থাবার নিচে মহিষাসুর থাকলেও মহিষ নেই। এও সম্ভবত বৈষ্ণব ধর্মের প্রভাব। দুর্গা এখানে ঘরের মেয়েরূপেই পূজিতা। ডাকের সাজ নয়, বিয়ের কনের মতোই লাল বেনারসী, অলংকারে সাজানো হয় দেবীকে। মায়ের চার হাতে পরানো হয় অসংখ্য শাঁখা। এই অপূর্ব মাতৃমূর্তি বৃন্দাবনের চতুর্ভুজা কাত্যায়নী দুর্গাপ্রতিমার আদলে তৈরি করা হয়।

প্রায় চারশো বছর আগে ধর্মপরায়ণ দাসচৌধুরী পরিবার ছিল ধনী ও প্রভাবশালী। তৎকালীন নবাবের কাছ থেকে জমিদারি পেয়েছিলেন পাঁচুগোপাল দাসচৌধুরী। তাঁর পিতা ভৈরব দাস এই চতুর্ভুজা দুর্গামূর্তির আরাধনা শুরু করেন। আগে এই পরিবারে কালী, দুর্গা, জগদ্ধাত্রী সব পুজোই হত সাড়ম্বরে। কিন্তু ক্রমশ অবস্থা খারাপ হয়ে যাওয়ায় তাঁদের পূর্বপুরুষেরা আর পুজো করবেন না বলে স্থির করেন এবং প্রতিমা ভাসিয়ে দিতে যান। তখন দেবীর স্বপ্নাদেশ পেয়ে তাঁরা চতুর্ভূজা দুর্গাপুজো শুরু করেন; দেবী বলেন যে এই মূর্তিতে পুজো করলেই সমস্ত পুজো করা হবে। সেই থেকে ভৈরব দাস চতুর্ভুজা দুর্গামূর্তির পুজো শুরু করেন। দুর্গাপুজোর সঙ্গেই কালী ও জগদ্ধাত্রীপুজো করা হয়, আলাদাভাবে নয়। বৈষ্ণবমতে পুজো হয় বলে বলি নেই, নেই অন্নভোগও। দেবীকে লুচি ভোগ নিবেদন করা হয়। কুমারীপুজোও হয় না। বৈষ্ণবধারার পুজোয় ঢাক, ঢোল, কাঁসি প্রভৃতি বাদ্যের সঙ্গে চলে হরিনাম সংকীর্তন। লোহার গাড়িতে প্রতিমা বিসর্জনের জন্য নিয়ে যাওয়া হয়। বিসর্জনের পর নতুন কাপড় পরিয়ে কাঠামো নিয়ে আসা হয় দালানে। শুরু হয় নিত্যপূজা। পারিবারিক পুজো হলেও এই পুজোকে কেন্দ্র করে কাটোয়ার মানুষের আনন্দের অভাব নেই।

দুর্গাপুজো বাংলার শ্রেষ্ঠ উৎসব। নবদ্বীপের

প্রতিবেশী পাড়া শান্তিপুরেও হয় দুর্গাপুজো। কবে থেকে সে-পুজো আরম্ভ হয়েছে তা নিয়ে মতভেদ রয়েছে। ঐতিহাসিক তথ্য বলে, শান্তিপুরে চাঁদুনীবাড়ির দুর্গাপুজোই সর্বাপেক্ষা প্রাচীন। ১৪৮৬ সালে চৈতন্যদেবের জন্ম। তার আগে চাঁদুনীবাড়ির বাসস্থান ছিল নবদ্বীপে। নিমাইয়ের বাল্যকালের গৃহশিক্ষক ছিলেন এই পরিবারের কাশীনাথ সার্বভৌম। হুসেন শাহের আমলে মুসলিম অত্যাচারে তিনি শান্তিপুরে চলে আসেন। তিনিই দুর্গাপুজোর প্রচলন করেন এই বাড়িতে। ১৫১০ সালের ৩০ জানুয়ারি নিমাই সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। তারপর তিনি শান্তিপুরে আসেন। বলা হয় এই সময় থেকেই চাঁদুনীবাড়ির দুর্গাপুজো শুরু হয়। জন্মাষ্টমীর পরদিন, অর্থাৎ নন্দোৎসবের দিন দুর্গাপুজোর কাঠামো পূজা করে মাটির প্রলেপ দেওয়া হয়। এ-বাড়ির পুজোয় মা স্বর্ণবর্ণা। সাতপুতুলের মাটির সাজে মায়ের মূর্তি তৈরি হয়। দুর্গার সাজ যোদ্ধাবেশ। এ-পুজো পাঁচশো বছরেরও প্রাচীন। সেক্ষেত্রে বলা যায় যে, চাঁদুনীবাড়ির দুর্গাপুজো শুধু শান্তিপুর নয়, পশ্চিমবাংলার প্রাচীনতম পুজো।

এই পুজোর বৈশিষ্ট্য হল, কলাবউ স্নান ও বোধন হয় ষষ্ঠীর দিন। পুজোয় দেবীর ঘটে ডাবের পরিবর্তে কলার ছড়া দেওয়া হয়। বাড়ির বউরা দেবীঘটে গঙ্গাজল ভরে আনেন। দুর্গার বাহন সিংহ অশ্বমুখী। সপ্তমী, মহাষ্টমী ও মহানবমী তিথিতে দেবীর পুজোর আগে চাঁদুনী মায়ের মন্দিরে আরতি হয়, তারপর রীতি অনুযায়ী দুর্গাপুজো শুরু হয়। এই পরিবারে সন্ধিপুজো হয় না। আগে পাঁঠাবলি দেওয়া হলেও এখন এই প্রথা বন্ধ হয়েছে। তার পরিবর্তে সপ্তমীর দিন জোড়া আখ এবং সপ্তমী, মহাষ্টমী এবং মহানবমী তিথিতে চালকুমড়ো বলি হয়।

চাঁদুনীবাড়ির ভোগেরও বৈশিষ্ট্য আছে। দেবীকে সপ্তমীতে সাত রকমের, অষ্টমীতে আট রকমের এবং নবমীতে নয় রকমের ভাজা নিবেদন করা হয়। প্রতিদিনের ভোগে দেওয়া হয় পাকা কলার বড়া ও চালতার চাটনি। নবমীর দিন ইলিশ ভোগ দেওয়া হয়। দশমীর দিন ভোগে থাকে ইলিশমাছের চাটনি এবং পান্তাভাত। এই বাড়ির দীক্ষিত মহিলারাই ভোগ রান্না করেন। আগে দুর্গাদালানে হোগলাপাতার ছাউনি দেওয়া ছিল। পরবর্তী কালে তা বাঁধিয়ে দেওয়া হয়। দশমীর দিন ঘট বিসর্জনের আগে পুরোহিত হাতের তালুর উপর চাল-যব বাটা দিয়ে মণ্ড তৈরি করে সেখানে সলতে দিয়ে আরতি করেন। দশমীর দিন সূর্যাস্তের আগে চাঁদুনীবাড়ির দেবী বিসর্জন হয় এবং বংশপরম্পরায় কাঁধে করে প্রতিমা নিয়ে গিয়ে বিসর্জন দেওয়া হয়।

কাটোয়া ও শান্তিপুরের দুর্গাপূজায় প্রত্যক্ষভাবে চৈতন্যদেব যুক্ত না থাকলেও, 'চৈতন্য প্রভাব' কাজ করেছে বলা যায় এবং কোনওভাবে তিনি ওই দুটি পরিবারের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত ছিলেন। কাটোয়া তাঁর দীক্ষার স্থান, শান্তিপুর তাঁর বাল্যশিক্ষকের বাসস্থান। কিন্তু প্রত্যক্ষভাবেও তিনি একটি স্থানে দুর্গাপুজো প্রবর্তন করেছিলেন বলে ওড়িশাবাসীরা বলেন। ১৫১২-১৫১৭ সালের মধ্যে যখন তিনি ওড়িশা ভ্রমণ করছিলেন, ১৫১৪ সালের শরৎকালে কটক শহরে বালুবাজারে বিনোদবিহারী দেবীমণ্ডপে চৈতন্যদেব ঘটপূজার মাধ্যমে দেবী দুর্গার পূজা প্রচলন করেন। এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যে, চৈতন্য মহাপ্রভুর পুজোই ওড়িশার প্রথম দুর্গাপুজো। তার আগে উৎকলবাসীদের মধ্যে দুর্গাপুজোর চল ছিল না। বিনোদবিহারী বালুবাজার পূজাকমিটির পুজো পাঁচশো তিন বছর পূর্ণ করেছে। ১৮৯০ সাল থেকে এটি সর্বজনীন পূজায় পরিণত হয়েছে, অবিচ্ছিন্নভাবে হয়ে আসছে। পুজোর চারদিন লক্ষ লক্ষ মানুষের ভিড় উপচে পড়ে। একশো ছাব্বিশ বছর ধরে মৃন্ময়ী মূর্তিতে পুজো চলছে। বিশেষত্ব হল : অদ্যাবধি বিগ্রহের মুখের কোনও পরিবর্তন করা হয়নি; মূর্তি তৈরিতে সিন্থেটিক রং ব্যবহার হয়

না। লাল মাটি, ফুল, সবজি ও স্থানীয় কেন্দু ফল থেকে ভেষজ রং তৈরি করা হয় এবং বিগ্রহ সাজানো হয়।

নিত্যানন্দকে চৈতন্যদেব বলেছিলেন, ''শ্রীপাদ, তোমার গৌড়রাজ্যে কাহারও নাহি অধিকার।'' বাস্তবিক, নিত্যানন্দ ছিলেন গৌড়ের রাজা, তিনি রাজবেশ ধারণ করতেন এবং গৌড়ের হৃদয়েশ্বর হয়েছিলেন বলেই বাঙালির মুখে মুখে প্রচলিত হয়েছিল যে 'হাটের রাজা নিত্যানন্দ'। তাই বাঙালি গেয়েছিল, 'একমন হয়ে যাও নিতাইচাঁদের দরবারে' কিংবা 'হরিনাম দিয়ে জগৎ মাতালে, আমার একলা নিতাই।' নিত্যানন্দ প্রভু ছিলেন শাক্ত অবধূত। তিনি সর্বদা ত্রিপুরাসুন্দরী যন্ত্র ধারণ করতেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজের তিনিই ছিলেন প্রধান পরিচালক। ১৫৩০ সালে গঙ্গাতীরে খড়দহে স্বগৃহে নিত্যানন্দ প্রভু দুর্গাপুজো শুরু করেন। এই পুজোর কয়েকটি বিশেষত্ব আছে। সিংহ এখানে ঘোটকাকৃতি। পাল ও সেন যুগের মতো এখানে মায়ের দুদিকে লক্ষ্মী-সরস্বতীর পরিবর্তে জয়া-বিজয়া আছেন। কার্তিক গণেশ অবশ্য আছেন। সন্ধিপুজোয় মাষকলাই বলি হয়। মা দুর্গা এখানে কাত্যায়নী নামে পূজিত হন। নিত্যানন্দ প্রভু যেখানে থাকতেন, খড়দহে সেই স্থান আজ কুঞ্জবাড়ি নামে পরিচিত, গত পাঁচ শতাব্দী ধরে তাঁর বংশধররা অবিচ্ছিন্নভাবে সেখানে শারদীয়া দুর্গার উপাসনা করে চলেছেন। কালে নিত্যানন্দ মহাপ্রভুর পরিবার প্রসারিত হয়ে কিশোর পরিবার, বিহারী, মাধব, লাল, কুমার, নন্দ, চাঁদ ও মোহন পরিবার হয়েছে এবং সঙ্গে সঙ্গে পুজোর আয়োজনও এক থেকে বহু হয়েছে। বর্তমানে মোহন পরিবারে সাড়ম্বরে পুজো হয়। চার শতক পরে নিত্যানন্দ মহাপ্রভুর চোদ্দোতম বংশধর তথা পরিবারের বয়োজ্যেষ্ঠ সদস্য সমরেন্দ্রমোহন গোস্বামীর হাতে আজ এই পুজোর ভার।

আজকের আন্দুল একসময় ছিল সরস্বতী নদীর তীরে। সেখানেই এক আটচালায় প্রায় চারশো বছর আগে দুর্গাপুজোর পত্তন করেন দত্তচৌধুরি বংশের কৃষ্ণানন্দ। সেখানে পদধূলি পড়েছিল চৈতন্যপার্ষদ নিত্যানন্দের। কৃষ্ণানন্দ তাঁর কাছে দীক্ষা নিয়ে পরম আনন্দ লাভ করেছিলেন। সেই থেকে ওই স্থানের নাম 'আনন্দধূলি'। লোকমুখে তা আন্দুল হয়ে যায়। সময় ঠিক জানা না গেলেও বংশে দুর্গাপুজো শুরু করেছিলেন রামশরণ। ষষ্ঠীতে দেবীকে সবুজ ওড়না পরিয়ে দেন বাড়ির মেয়েরা। দশমীতে সবুজের পরিবর্তে আসে লাল ওড়না। এই রীতি পালিত হয়ে আসছে কয়েক শতক ধরেই। এখনও নিয়ম মেনে পুজোর ভোগে সাজানো হয় পুরীর জিবেগজা ও খাজা। এছাড়াও নারকেল নাড়ু, চন্দ্রপুলি, ক্ষীরের ছাঁচ, মনোহরা সহ মিষ্টিভোগের সঙ্গে মহানৈবেদ্যর মাথার উপরে দেওয়া হয় আগমণ্ডা। চন্দনী ক্ষীর দিয়ে মোড়া এই মণ্ডার চুড়ো সাজানো হয় পেস্তা, বাদাম ও কিসমিস দিয়ে, ভিতরে থাকে মেওয়া, নারকেলবাটা আর ক্ষীরের পুর, উপরে মেওয়ার পরত। প্রথমে এ-পুজোয় বলি হত। কিন্তু কোনও এক প্রজন্মে বাড়ির কর্তা পশুবলি বন্ধ করার স্বপ্নাদেশ পান, তারপর থেকে বলি বন্ধ। ভোগ হয় সম্পূর্ণ নিরামিষ।

'গৌড়ের রাজা' নিত্যানন্দের নির্দেশেই বাংলার শাক্ত ও বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের ঐক্য সাধিত হয়েছিল। শাক্ত সাধক রামপ্রসাদ গেয়েছিলেন, ''কালী হলি মা রাসবিহারী, নটবর বেশে বৃন্দাবনে।'' খড়দহে গঙ্গাতীরেই শ্রীপাদ নিত্যানন্দ প্রভুর আবাস ছিল। তাঁর প্রভাবে এখানে ধর্মীয় ভেদাভেদ দূর হয়ে গিয়েছিল। আনুমানিক ১৫১৪-১৫ সালে তাঁরই নেতৃত্বে পানিহাটিতে চিঁড়াদধি মহোৎসব (দণ্ড মহোৎসব) অনুষ্ঠিত হয়েছিল। অনেকে মনে করেন, এই মহোৎসব বাঙালির মধ্যযুগীয় ধর্মান্ধতার অন্ধকার দূর করে জাতির পুনরুত্থানের বীজ বপন করেছিল। নিত্যানন্দ মহাপ্রভুর প্রভাবে শাক্ত

সম্প্রদায়ও নিজেকে নতুনভাবে খুঁজে পেয়েছে এবং বাংলায় বারো ভুঁইয়ার উত্থান ঘটেছে। আর এসমস্ত কিছুর নেপথ্যে চৈতন্যদেবের ভূমিকা মানতেই হয়, কারণ অবধূত নিত্যানন্দকে বহু অনুনয় করে তিনিই গৃহী হতে রাজি করিয়েছিলেন এবং নীলাচল থেকে গৌড়ে পাঠিয়েছিলেন সম্ভবত এই গূঢ় উদ্দেশ্যেই। সাম্প্রদায়িকতার ভেদ ঘুচিয়ে অবতার ও মহাপুরুষরা সব ধর্মমতের প্রতি শ্রদ্ধা দেখিয়ে যান। সন্ন্যাস নেওয়ার পর নীলাচলের পথে পূর্ব বর্ধমানের শীতলগ্রামে চৈতন্য তাঁর অনুচর ধনঞ্জয় পণ্ডিতকে বাস করার নির্দেশ দিয়ে নিজে কাঠের রাধাকৃষ্ণ মূর্তি তৈরি করিয়ে দিয়ে যান; ডাকাত অধ্যুষিত ওই অঞ্চল একটি বৈষ্ণবপীঠে পরিণত হয়। আবার তিনিই কটকে দুর্গাপুজোর প্রবর্তন করেন। হরিনাম সংকীর্তন বা দুর্গাপূজা—দুই-ই মানুষে মানুষে মিলনের সেতু। কোথায় কখন কীভাবে মানুষের কল্যাণ হবে, তা জানেন কেবল মহামানবরাই। বৈষ্ণবধর্মের ইষ্ট শ্রীকৃষ্ণই প্রথম দুর্গাপূজা করেছেন গোলোকে, রাসমণ্ডলে, বসন্তকালে।

''পুরা স্তুতা সা গোলোকে কৃষ্ণেণ পরমাত্মনা।
সংপূজ্য মধুমাসে চ সংপ্রীতে রাসমণ্ডলে॥''

(ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ, প্রকৃতিখণ্ড ৬৬/২)

ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণ তাঁর যোগমায়া শক্তি দুর্গাকে বলছেন, ''তুমি পৃথিবীতে নানা নামে পূজিত হবে এবং ভক্তগণ নানা পূজাসামগ্রীর দ্বারা তোমার আরাধনা করবে।'' (১২।২।১০-১২)

মহাভারতে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পূর্বে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বিজয়লাভের জন্য অর্জুনকে দুর্গাস্তব করতে আদেশ করেছিলেন। (ভীষ্মপর্ব, ২৩।৪-১৬)। পরম বৈষ্ণব শ্রীজীব গোস্বামী ভাগবতের ব্যাখ্যায় বলেছেন, ''যঃ কৃষ্ণ সৈব দুর্গা স্যাৎ। যা দুর্গা কৃষ্ণ এব সঃ॥'' (শ্রীজীব গোস্বামী কৃত ব্রহ্মসংহিতা টীকা) অর্থাৎ যে কৃষ্ণ সে-ই দুর্গা, যে দুর্গা সে-ই কৃষ্ণ। উভয়ে অভিন্ন। তিনি আরও বলেছেন, ''অতঃ স্বয়মেব শ্রীকৃষ্ণস্বরূপঃ শক্তিরূপেণ দুর্গা নাম।'' অর্থাৎ, স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণস্বরূপ যিনি তিনিই শক্তিরূপিণী দুর্গা। বলা হয়েছে, কলিকালে কৃষ্ণ এবং কালী জাগ্রত। কালীর বীজমন্ত্র ক্রীং, এবং কৃষ্ণের বীজমন্ত্র ক্লীং। উভয় বীজমন্ত্রের অর্থ একই। চৈতন্যপন্থী বৈষ্ণবদের মূল দীক্ষামন্ত্র হল অষ্টাদশাক্ষর কৃষ্ণমন্ত্র। বিনিয়োগ অনুসারে তার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা দুর্গা!

শ্রীচৈতন্য সমাজবিপ্লব ঘটিয়েছিলেন। ব্রাহ্মণ থেকে শুরু করে নিম্নবর্ণের মানুষদের এক সারিতে এনে দাঁড় করিয়েছিলেন। ঘোষণা করেছিলেন, শূদ্রও ভক্তির অধিকারে লাভ করতে পারে উচ্চ আধ্যাত্মিক অবস্থা। মহামিলনের ক্ষেত্রকে দৃঢ় করতে কেবল মৌখিক নামজপই নয়, জাত্যাভিমানের পাঁচিল ভাঙতে নজির সৃষ্টি করেছিলেন তিনি। তিনি অব্রাহ্মণ রামানন্দ রায়কে দিয়ে শাস্ত্র ব্যাখ্যা করিয়েছেন; তাঁর ব্রাহ্মণ ভক্তেরা 'দাস' আত্মপরিচয় দানের মাধ্যমে নিজেদের ব্রাহ্মণ্য অভিমান লুপ্ত করেছেন। ভক্ত ব্রাহ্মণ ঈশান তাঁর উপবীত ছিঁড়ে বৈষ্ণবসেবার অধিকারী হয়েছিলেন। কীর্তনের ভাববন্যাও এদেশের সমাজ ও ধর্মে গভীর রেখাপাত করেছিল। তাই সমাজে এসেছিল নব সৃষ্টির প্রাণচাঞ্চল্য। তাঁর ভক্তিবাদ সমাজকে নতুন বিশ্বাস ও ঐক্যের সন্ধান দিয়েছিল। তাই শক্তিপূজা বা নামকীর্তন—যেকোনও উপায়েই তিনি ছত্রখান হয়ে যাওয়া হিন্দুর বিশ্বাস ও ঐক্যকে দৃঢ় করতে চেয়েছিলেন। তবে সবই এক অ-সচেতন আবেশে, যুগপ্রয়োজনে এক পরম শক্তির অলক্ষ্য নির্দেশে।

সহায়ক গ্রন্থ

১। অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য, *পরামৃত শ্রীশ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত*, দেজ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৯৯৮
২। ড. জয়দেব মুখোপাধ্যায়, *কাহাঁ গেলে তোমা পাই*; প্রাচী পাবলিকেশনস, ২০১০